

# বিহারের জাতভিত্তিক জনগণনা

শ্রীমতী সরকার

বিহারে একটা জাত-জনগণনা হয়ে গেছে। যদিও আইনি জটিলতায় সেটার নাম দিতে হয়েছে জাত-সমীক্ষা (কারণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ছাড়া কেউ ‘জনগণনা’ করতে পারে না), কিন্তু তা জনগণনার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। বিহার সরকার এই জাত জনগণনা করেছে প্রায় এক বছর ধরে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই জাত-জনগণনার বিরোধিতা করেছে। তারপর এই জাত-জনগণনার ফল প্রকাশ যাতে না হয়, তার জন্য মামলা হয়েছে বিহারের হাই কোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধিতা করেছে এই ফলাফল প্রকাশের, কিন্তু সেই বিরোধিতা টেকেনি। ২০২৩ এর অক্টোবর নভেম্বর মাসে এর ফল প্রকাশ হয়েছে।

একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই জনগণনায় প্রকাশ করা হয়নি — সে কারণে এই জনগণনার ফলাফল অসম্পূর্ণ, এটা প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই জনগণনায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পরিবারের কৃষিজমি এবং বাস্তুজমি কতটা আছে? — কিন্তু তার কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশিত রিপোর্টে নেই।

বিহারে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ভূমিহার, এবং কায়স্থ — হিন্দুদের মধ্যে এই চারটি জাত এগিয়ে-থাকা। মুসলিমদের মধ্যে শেখ, পাঠান (খান) এবং সৈয়দ — এই তিনটি জাত এগিয়ে-থাকা। এগিয়ে-থাকা বলতে জনগণনা রিপোর্টে বলা হয়েছে — সাধারণ (হিন্দিতে সামান্য বর্গ)। আমরা কথ্য বাংলায় এবং ইংরেজিতে যাকে বলি, জেনারেল কাস্ট। এছাড়া যাদব, কুশবাহা (কোইরি), কুমী, বেনিয়া, সুরজাপুরী মুসলিম, সোনার, গোস্বামী, ঘটবার, ভট্ট, মলিক ইত্যাদি তিরিশটি জাতকে পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ বলা হয়েছে। তেলি, মাল্লা,



কানু, ধানুক, নোনীয়া, চন্দ্রবংশী (কাহার, কমকার), নাই, বদই, মোমিন ইত্যাদি একশ' বারোটি জাতকে অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা জাতবর্গ বলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে তপশিলি জাতিবর্গ — যার মধ্যে আছে দুসাধ, চামার, মুসহর, পান, পাসি ইত্যাদি বাইশটি জাতি। আর সাঁওতাল, গোনদ ইত্যাদি বত্রিশটি জনজাতি নিয়ে আছে তপশিলি জনজাতিবর্গ। আরও কিছু সামান্য সংখ্যক মানুষের কিছু জাত আছে, যারা মোট জনসংখ্যার ০.১৪ শতাংশ, যাদেরকে এই জাত-গণনায় এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের মধ্যেই ধরা আছে।

বিহারে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ এগিয়ে-থাকা জাতবর্গ-এর মানুষ। অপরপক্ষে পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের মানুষ ২৭ শতাংশ, অত্যন্ত-পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ-র মানুষ ৩৬ শতাংশ। তপশিলি জাতিবর্গভুক্ত মানুষ প্রায় কুড়ি শতাংশ। এবং প্রায় দুই শতাংশ তপশিলি জনজাতিবর্গ-র অন্তর্গত।

এই জনগণনায় জানতে চাওয়া হয়েছিল, পরিবারের মাসে মোট আয় কত? তার উত্তরের ভিত্তিতে, যাদের পারিবারিক মাসিক মোট আয় মাসে ছ'হাজার টাকার নিচে (অর্থাৎ দৈনিক ২০০/- টাকার নিচে) তাদের 'গরীব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চিহ্নিতকরণ অনেকদিন ধরেই ভারতবর্ষে প্রশাসনিক স্তরে ব্যবহার হয়। বিহারে এই 'গরীব' এর পরিমাণ মোটের ওপর ৩৪ শতাংশ। এছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, অন্ততঃ ৮২ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় কুড়ি হাজার টাকার নিচে। স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে-থাকা জাতগুলির মধ্যে দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু সেটাও খুব কম নয়। অপরপক্ষে তপশিলি জাতি এবং জনজাতিভুক্ত জাতগুলির মধ্যে তেতাল্লিশ শতাংশ পরিবারই 'গরীব'। শিক্ষা ইত্যাদি অন্যান্য সূচকেও এই ধারা বজায় থেকেছে। বিহারে মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ নিরক্ষর। তপশিলি জাতিগুলির মধ্যে এই পরিমাণ ৪১ শতাংশের বেশি। মোটের ওপর প্রায় ৫৪ শতাংশ মানুষ হয় নিরক্ষর বা জাস্ট স্বাক্ষর।

বিহারে মাত্র দেড় শতাংশের মতো লোক সরকারি চাকরি করে এবং আরও সওয়া এক শতাংশ মানুষ উচ্চ বেতনের প্রাইভেট জব করে। আরও দুই শতাংশ মতো কম মাইনের প্রাইভেট জব করে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ শতাংশ রোজগার করে না (গৃহিণী, গৃহী, ছাত্রছাত্রী, বেকার, বয়স্ক ইত্যাদি)। চাষি-ভাগচাষি-কৃষিমজুর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। মিস্ত্রি-মজদুরি ইত্যাদি ঠিকা বা চুক্তি শ্রমের কাজে যুক্ত প্রায় সতেরো শতাংশ মানুষ। ব্যবসা আছে তিন শতাংশের। ফলে উপার্জন করছে যারা, তাদের মধ্যেই যদি শুধু হিসেব নেওয়া হয় — তাহলে অর্ধেকের বেশি উপার্জনকারী মানুষ ঠিকা/চুক্তি শ্রমের কাজ করে উপার্জন করে। কৃষিক্ষেত্র থেকে উপার্জন করে (চাষি-ভাগচাষি-কৃষিমজুর) সিকি ভাগ। ব্যবসা করে দশভাগের প্রায় একভাগ উপার্জনকারী মানুষ। উপার্জনকারীদের মধ্যে চাকরি করে পনেরো



শতাংশ, তার মধ্যে সরকারি চাকরি করে পাঁচ শতাংশ, বেসরকারি চাকরি করে বাকি দশ শতাংশ। এইভাবে উপার্জনকারীদের মধ্যেই কেবল হিসেব করলে, সরকারি চাকরি করে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গ-র দশ শতাংশ মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত-পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ-র মাত্র তিন শতাংশ মানুষ; মিস্ত্রি-মজুর অর্থাৎ ঠিকা/চুক্তি শ্রমের কাজ করে তপশিলি জাতিগুলির দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ, অপরপক্ষে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের এক তৃতীয়াংশ মানুষ।

বিহারে চল্লিশ শতাংশ মানুষের পাকা বাড়ি নেই। চৌদ্দ শতাংশ ঝুপড়ি-বসতিতে থাকে। তপশিলি জাতিদের বাহ্যিক শতাংশের পাকা বাড়ি নেই, তেইশ শতাংশ ঝুপড়িতে থাকে। এগিয়ে-থাকা জাতগুলির মধ্যে ঝুপড়িতে থাকা মানুষের শতাংশ মাত্র ছয়; ব্যতিক্রম শেখ-রা, যাদের তেরো শতাংশের মতো ঝুপড়িতে থাকে এবং আরো তিরিশ শতাংশের পাকা বাড়ি নেই।

বিহারে সাড়ে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের কোনও মোটরযান নেই। যে সাড়ে চার শতাংশের মোটরযান আছে, তাদের মধ্যে নিরক্ষর অংশের (তিরিশ শতাংশের) মোটরযান বলতে আছে মোটরবাইক বা স্কুটার। মোট তেরো কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র আঠারো লক্ষ মানুষের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার আছে।

বিহারের জাত জনগণনা দেখায়, জাতবর্গগুলির মধ্যে অন্তর্গত জাতগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফারাক অনেকটাই। বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে, অনেক জাতই যে জাতবর্গের মধ্যে আছে, সেই জাতবর্গে না থেকে ভিন্ন জাতবর্গে থাকার কথা। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য এগিয়ে-থাকা জাতবর্গ এবং পিছিয়ে-থাকা ও অত্যন্ত-পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গগুলির ক্ষেত্রে। তপশিলি জাতি ও জনজাতি বর্গ দুটির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। তপশিলি জাতি ও জনজাতি বর্গ তৈরি হবার ভিত্তি বর্তমান এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকার নয়, বরং ঐতিহাসিকভাবে অস্পৃশ্যতা সহ আরো নানা বিদ্বেষের শিকার হওয়ার কারণে। তাদের সমাজের মূল স্রোতে টেনে আনার প্রয়োজনে সংবিধানে তপশিলি জাতি ও জনজাতিগুলিকে আলাদা দুটি বর্গ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছিল, যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল সেই সময়। পরে মধ্যভারতের সমতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে (যার প্রশাসনিক ফসল পঞ্চাশের দশকে কাকা কালেলকর কমিশন, সত্তরের দশকে বিহারে কর্পূরী ঠাকুরের নেতৃত্বে জনতা সরকার, মণ্ডল কমিশন ইত্যাদি) তপশিলি জাতি ও জনজাতি জাতবর্গ ছাড়াও পিছিয়ে থাকা ও অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা বর্গ আলাদা করা হয়েছিল। সেটা করা হয়েছিল কোনও ঐতিহাসিকতার ওপর ভিত্তি করে নয়। ১৯৩০ সালের জাতভিত্তিক জনগণনায় তপশিলি জাতিবর্গ এবং জনজাতিবর্গের অন্তর্গত নয় এমন জাতগুলির পরিসংখ্যান পাওয়া গেছিল। ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন সমীক্ষা চালিয়েছিল এগারোটি সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে এইসব জাতগুলির পরিস্থিতি কেমন তা জানতে। তাতে



বেশ কিছু জাতকে অন্যান্য পিছিয়ে-থাকা জাতের তকমা দেওয়া হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, ১৯৮০ থেকে ২০২৩ — এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। নয়ের দশকে জনতা সরকারের আমল থেকে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য-পিছিয়ে-পড়া জাতবর্গের সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণ ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়েছে। অভিযোগ ওঠে, সেই সংরক্ষণের সিংহভাগই গেছে জাতবর্গের অন্তর্গত দু-একটি জাতের কজায়। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিন্যাসের পুনর্মূল্যায়ন ও সেই অনুযায়ী বিন্যাসেরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

যেমন, বেনিয়া (হিন্দু) এবং মালিক (মুসলিম) এই দুটি জাত পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের মধ্যে আছে। কিন্তু এদের অর্থনৈতিক অবস্থা পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের বাকি জাতগুলির মতো নয়, তাদের চেয়ে ভালো। বেনিয়াদের মধ্যে ‘গরীব’ এর হার এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের গড়-এর সমান (২৫ শতাংশ)। মালিকদের মধ্যে তা আরো অনেক কম (১৭ শতাংশ)। বেনিয়াদের মধ্যে প্রায় আটান্ন শতাংশের দুই বা আরো বেশি কামরার পাকা বাড়ি রয়েছে, যা এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের গড়ের (৫২ শতাংশ) চেয়েও অনেক বেশি। মালিকদের সাতষড়ি শতাংশ —র দুই বা বেশি কামরার পাকা বাড়ি রয়েছে। ফলে এই দুটি জাতকে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গে ঢোকানো দরকার। অপরদিকে এগিয়ে থাকা জাতবর্গের মধ্যে শেখ-দের মাত্র ৩২ শতাংশের দুই বা তার বেশি কামরার পাকা-বাড়ি রয়েছে। শেখ-দের মধ্যে ‘দরিদ্র’ ২৬ শতাংশ, যা এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের গড়ের (২৫ শতাংশ) প্রায় সমান হলেও, পারিবারিক মাসিক আয় ছ-হাজারের ওপরে (অর্থাৎ ‘দরিদ্র’ নয়) কিন্তু দশ-হাজারের নিচে — এরকম ৩৩ শতাংশ, যা এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের এই ব্যাপারে গড় (২৪ শতাংশ) —এর তুলনায় অনেক বেশি। ফলে শেখদের কখনোই এগিয়ে-থাক জাতবর্গে রাখা উচিত নয়, তাদের পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু বিহারে তপশিলি জাতি এবং জনজাতিগুলি সামগ্রিকভাবে সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে অন্যান্য সমস্ত জাতবর্গ-র থেকে এখনও পিছিয়ে আছে। ফলে ঐতিহাসিক বঞ্চনা ভিত্তিক তপশিলি জাতি ও উপজাতি সংরক্ষণ এখনও রেখে দেওয়া দরকার।

গত ২০১৯ সাল থেকে ধীরে ধীরে সারা ভারত জুড়ে চালু হয়েছে আরেকটি সংরক্ষণ (সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে) — এগিয়ে-থাকা জাতবর্গগুলির মধ্যে অস্বচ্ছল পরিবারগুলির মানুষদের জন্য সংরক্ষণ বা পরিভাষায় ইডবলুএস। এই অস্বচ্ছলতার মাপকাঠি হল, যাদের পারিবারিক বাৎসরিক আয় আট লক্ষ টাকার (অর্থাৎ মাসিক আয় ৬৭ হাজার টাকা) কম। অপরপক্ষে অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জাতবর্গের বা ওবিসি সংরক্ষণের শুরু থেকেই ওই সংরক্ষণটি কেবলমাত্র অস্বচ্ছল অংশের জন্যই প্রযোজ্য। এই অস্বচ্ছল অংশের মাপকাঠি পারিবারিক বাৎসরিক আয়ের সীমা, যা ১৯৯৩



সালে করা হয় এক লক্ষ টাকা, ২০০৪ সালে আড়াই লক্ষ টাকা, ২০০৮-এ সাড়ে চার লক্ষ টাকা, ২০১৩-তে ছয় লক্ষ টাকা, এবং ২০১৭-তে আট লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, ইউবলুএস হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক সংরক্ষণের নামে আসলে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের সংরক্ষণ। ১৯৯০ সালে সাতাশ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ চালু হয় জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর আমলে। মণ্ডল কমিশন বলেছিল প্রায় বাহান্ন শতাংশ ভারতবাসী ওবিসি, অর্থাৎ জনসংখ্যার অর্ধেক অনুপাতে সংরক্ষণ। প্রসঙ্গতঃ তপশিলি জাতি ও জনজাতি সংরক্ষণ জনসংখ্যার সমানুপাতিক। এই ওবিসি সংরক্ষণ চালুর সময় এগিয়ে-থাকা জাতবর্গগুলির ভেতর থেকে তীব্র প্রতিবাদ হয়। এই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই ছিল পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ এবং তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষমূলক (১৯৯০ সালে এই আন্দোলনের একটি জনপ্রিয় রূপ ছিল রাস্তায় বসে জুতো-পালিশ)। ২০১৯ সালের এগিয়ে-থাকাদের সংরক্ষণ বা ইউবলুএস এইসব প্রতিবাদ আন্দোলনগুলিরই প্রশাসনিক রূপ। বিহারের জাত-জনগণনা দেখায়, দশ শতাংশ ইউবলুএস সংরক্ষণের কল্যাণে এগিয়ে-থাকা জাতগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক সংরক্ষণ (পনেরো শতাংশের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ) অন্যান্য-পিছিয়ে-থাকা বা ওবিসি জাতগুলির, অর্থাৎ বিহারে পিছিয়ে-থাকা ও অত্যন্ত-পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের সম্মিলিত জনসংখ্যার আনুপাতিক সংরক্ষণের (তেষাটি শতাংশের জন্য তিরিশ শতাংশ) চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ, মোদি জমানার ইউবলুএস সংরক্ষণ আসলে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গগুলির তোষণ, সমতার বিপরীতমুখী যাত্রা। বিহারের জাতভিত্তিক জনগণনার সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক তাৎপর্য এটাই।

বিহার সরকার এই জনগণনার রিপোর্টের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে পিছিয়ে থাকা ও অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা জাতবর্গদুটির সংরক্ষণ মোট তিরিশ থেকে বাড়িয়ে তেতাল্লিশ শতাংশ করেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে দুটি আইন করে এটি চালুও হয়ে গেছে। কিন্তু বিহারে সরকারি চাকুরে উপার্জনকারীদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ, উচ্চশিক্ষার হারও বেশ কম। তাই এই বদল জরুরি হলেও পর্যাপ্ত নয়। যদি জাত-জনগণনার তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে জাত-সমতার দিকে যেতে হয়, তাহলে প্রয়োজন কাদের কত চাষজমি ও বাস্তুজমি আছে সেই তথ্যও, যা সংগৃহীত হয়েছে, তা সংকলিত করা। তারপর পারিবারিক মাসিক আয়, জমির পরিমাণ, কাঁচা/পাকা বাড়ি বা ঝুপড়ি, পেশা কী এবং সেই পেশার গড় আয়ের সরকারি পরিসংখ্যান — এই সূচকগুলির ভিত্তিতে কোন জাতের কী অবস্থা সেটা মাপা যায়। কোন সূচকটির কত গুরুত্ব তা রাশিবিজ্ঞানীরা বলবে। সেই অনুযায়ী এগিয়ে-থাকা এবং পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ তিনটির পুনর্বিন্যাস করা ও সমতার দিকে নানা কর্মসূচী নেওয়া যায়।।